সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

অবশ্য বান্দা সে-ই যে তার জীবনকে আল্লাহর
আমানত মনে করে– এবং সেই ভেবে
মহামূল্যবান এই গচ্ছিত ধনের হেফাজত করে।

সূফী

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন

ভাদ্র ১৪২১, আগস্ট ২০১৪, শাওয়াল ১৪৩৫

** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ প্রণীত হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহঃ) সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন "সংলাপ সমগ্র" গ্রন্থটি পুনরায় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক সংকলন 'সূফী'-তে ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে। তাঁর (প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ) সদয় অনুমতি নিয়েই আপনাদের সামনে আবার 'সংলাপ'গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। **

আল্লাহর রজ্জু এবং ধ্বংসের আগুন

আতা : হুজুর, গত জুমার তাকরিরে আপনি অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির ওপর মন্তব্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস আপনি উদ্ধৃত করেছেন। এ সম্পর্কে একটু বললে পাঠক উপকৃত হবেন।

গুরু : রাসুলে পাক (সাঃ) বলেছেন– শেষ জামানায় এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ মানুষের অত্যাচারে জর্জরিত হবে, মানুষ মানুষের ভয়ে অস্থির হবে। তখন বুঝতে হবে যে কিয়ামত নিকটবর্তী।

আতা : হুজুর, আমরা কি সে ভয়াল সময়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি?

গুরু : হাদিসে কিয়ামতের যেসব লক্ষণের কথা বলা হয়েছে সেগুলো কি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছো না? এ লক্ষণগুলো মিলিয়ে দেখলেই তো পারো। প্রথমত, সমাজের মুসলিম নারী তার স্বামী কিংবা পিতামাতার আদেশ অমান্য করে নিজের খেয়াল-খুশিতে চলবে। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, পিতারা তাদের কন্যাদের দিয়ে ব্যবসা করাবে। স্বামীরা সতিসাধ্বী স্ত্রীদের দ্বারা অবৈধ ব্যবসা করাবে। আর স্বামীরা স্ত্রীদের উপার্জনের ওপর বসে বসে খাবে– ইত্যাকার লক্ষণগুলো যখন দেখবে তখন বুঝবে কিয়ামত নিকটবর্তী। দ্বিতীয়ত, আলেমদের কাছ থেকে তাদের বিদ্যা কেড়ে নেয়া হবে। তৃতীয়ত, ওলেমাদের মধ্যে ধর্মগত অনৈক্য চরম আকার ধারণ করবে। চতুর্থত, ধর্মবোধ নেই, মানবতা নেই– এ ধরনের মুসলমান নামধারী লোক তোমাদের শাসনকর্তা হয়ে বসবে। পঞ্চমত, আত্মকলহে লিপ্ত মুসলমান একে অপরকে নির্দ্বিধায় হত্যা করবে।

আতা : লক্ষণ তো হুজুর সবগুলোই মিলে যাচ্ছে।

গুরু : অথচ তোমাদের মর্তবা কী ছিল। ইসলাম এসেছে পৃথিবীতে মুর্দাকে জিন্দা করার জন্য– জীবিতকে মুর্দা করার জন্য নয়। সুরা ফাতিরের ১০ নং আয়াত কিংবা সুরা ইব্রাহিমের ২৪ নং আয়াতে দেখো– কালেমা তাইয়্যেবার স্থান কোথায়। এই কালেমা তাইয়্যেবার মন্ত্রে যাঁরা দীক্ষিত তাঁদের স্থান তো হবে আকাশের উচ্চতায়। মুসলমানের মান-ইজ্জত তো ধূলিতে লুটাবার নয়। তোমাদের সমাজে আজ নারীর সম্ভ্রম নেই, পিতার সামনে কন্যাকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, এক ভাই অন্য ভাইকে হত্যা করছে, মানুষ আজ মানুষের অত্যাচারে জর্জরিত অথচ বিচার নেই কোথাও– বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। ব্যক্তিগত ঈর্ষা, দ্বেষ, জেদাজেদিকে– স্বার্থান্ধ ক্ষমতার লিপ্সাকে– আজ তোমরা রাজনীতি বলছো। একদিকে অবরোধ অসহযোগ দিয়ে তোমরা সমস্ত দেশের মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশাকে ডেকে এনেছো। অন্যদিকে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য ভোটের নামে একটা প্রহসনকে হালাল করার চেষ্টা করছো।

সমস্ত দেশ আজ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এদিকে একটা তৃতীয় শক্তি ওঁৎ পেতে আছে তোমাদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে আবার তোমাদের কাঁধে গোলামির জিঞ্জির পরিয়ে দেবার জন্য। ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই তোমরা স্বাধীন ছিলে না। আল্লাহর অশেষ নেয়ামতে তোমরা ১৯৭১ সালে গোলামির জিঞ্জির কেটে স্বাধীন হয়েছো। এই অমূল্য নেয়ামতকে আজ তোমরা হেলায় হারাতে বসেছো। তোমরা যদি এভাবে চলো তাহলে তোমাদের এ স্বাধীনতা তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে। অথচ তোমরা জানো না তোমাদের এ সোনার দেশের মাটির নিচে কী অন্তহীন সম্পদ রয়েছে। এ দেশের মাটির নিচে তেলের খনি আছে– এতো বিপুল পরিমাণে আছে যে একদিন সারা পৃথিবীকে তোমাদের দুয়ারে আসতে হবে জ্বালানির জন্য। তোমাদের দেশে বিপুল খনিজ সম্পদ রয়েছে– এমনকি হীরার খনিও রয়েছে। তোমরা যে সম্পদ নিয়ে কুকুরের মতো কামড়া-কামড়ি করছো সেই ঐশ্বর্যের তুলনায় এ তো কিছুই নয়।

আমি হাসিনা-খালেদা দুজনকেই চিনি। চিনি বলেই তাদের বলছি বিরোধের এ পথে মঙ্গল নেই। সবচেয়ে বড় কথা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য দেশকে ধ্বংস করার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা একে অপরের গলা কাটতে উদ্যত হয়েছো। অথচ কুরআন পাকে বলা হয়েছে– ওয়া তাসিমু বি হাবলিল্লাহি জামিয়াউ ওয়ালা তাফাররাকু (সুরা ইমরান/১০৩)। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত হাতে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। এখানে রজ্জু মানে কালেমা তাইয়্যেবা– যাঁরা এই মন্ত্রে দীক্ষিত তাঁদের একে অপরকে শক্ত হাতে ধরে থাকতে বলা হচ্ছে। অথচ বিভেদের হিংসায় উন্মত্ত যারা তারা মুসলমান বলে দাবি করে। হাসিনা মুসলমান, খালেদা মুসলমান, জামায়াতে ইসলামী মুসলমান, জাতীয় পার্টি মুসলমান, পীর সাহেব চরমোনাই মুসলমান। তারা যদি সবাই মুসলমান হবেন তবে কুরআনের এই আদেশ তারা অমান্য করছেন কেন। আমি জানতে চাই তাদের কাছে। কেন তারা এ হিংসায় মত্ত।

তোমাদের দেখেশুনে সেই পাগলের কথা মনে পড়ে। এক পাগলা গারদে একদিন এক পাগল পাগলা গারদের অধ্যক্ষের চেয়ারে বসে পড়লো। এর মধ্যে আরো কয়েকজন পাগল এসে হাজির হলো। অধ্যক্ষ সাহেবও আসলেন। প্রথম পাগলটি বললো– জানেন ভাইসব এই যে লোকটি (অধ্যক্ষ সাহেব) এই লোকটি পাগল, ও আমার চেয়ার দখল করে নিতে চায়। এর মধ্যে আরেক পাগল প্রথম পাগলকে চেয়ার থেকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে বললো– ভাইসব আসলে এই লোকটাই (প্রথম পাগল) পাগল। আর এই যে চেয়ার দেখছেন, এ চেয়ার আমার প্রাপ্য। তোমাদের দেশের রাজনীতি আজ এই পাগলামির নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। চেয়ার একটা, আর ঐ চেয়ারে সব পাগলই এসে বসতে চায়। দেশবাসী সকলেই আজ একথা জেনে রাখুক মানুষের প্রথম ভালোবাসা হচ্ছে মানুষের প্রতি। এরপর হচ্ছে ধর্মের প্রতি ভালোবাসা। যারা মানুষকে ভালোবাসতে জানে না তাদের কোনো ধর্ম নেই। তারা অন্ধ। এখনো সময় আছে বিরোধ সহিংসতা পরিহার করে মানুষের মর্যাদায় সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসো। তা না-হলে ধ্বংস অনিবার্য। সে ধ্বংসের আগুনে সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ■

বিশ্বনবী (সা.)-এর দেখানো সৌভাগ্যের সিঁড়ি

(তৃতীয় পর্ব)

বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সা.) তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র ও উত্তরাধিকারী আলী (আ.)-কে সম্বোধন করে আরো বলেছেন : হে আলী! মিথ্যা কারণে আল্লাহকে নিয়ে কসম করবে না আর সত্যের ক্ষেত্রেও আবশ্যক না হলে তা করবে না। আল্লাহকে তোমাদের কসমের হাতিয়ারে পরিণত করো না। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহকে নিয়ে মিথ্যা কসম করে আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না এবং তার প্রতি সদয় হন না।

হে আলী! আগামীকালের জীবিকা নিয়ে দুঃখ করো না। কারণ, প্রত্যেক আগামীকালের (সঙ্গে তার জন্য নির্ধারিত) জীবিকাও এসে পড়ে।

হে আলী! গোঁয়ার্তুমি থেকে দূরে থাকো। এর গোড়ায় রয়েছে মূর্খতা আর পরিণামে রয়েছে অনুশোচনা।

হে আলী! দাঁত মাজতে ভুলো না। কারণ, দাঁত মাজার ফলে মুখ পবিত্র হয়, আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং চোখের জ্যোতি বাড়ে। আর দাঁত খিলাল করার কারণে তুমি ফেরেশতাদের প্রিয় হবে। কারণ, যে ব্যক্তি খাওয়ার পর দাঁত খিলাল করে না তার মুখের দুর্গন্ধে ফেরেশতারা বিরক্ত হয়।

হে আলী! রাগান্বিত হয়ো না। আর যদি রাগান্বিত হও, তা হলে বসে পড়ো এবং আল্লাহর বান্দাদের ওপর তাঁর ক্ষমতার কথা এবং তাদের প্রতি তাঁর ধৈর্যের কথা চিন্তা করো। আর যখন তোমাকে বলা হয় : আল্লাহকে ভয় করো, তখন তোমার ক্রোধকে দূরে ঠেলে দাও এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় প্রত্যাবর্তন করো। হে আলী! তোমার নিজের জন্য যা কিছু ব্যয় করো তার মধ্যে আল্লাহকে (সন্তুষ্টিকে) উদ্দেশ্য করো। যাতে আল্লাহর কাছে তোমার জন্য সঞ্চয় হয়। হে আলী! নিজ পরিবার, প্রতিবেশী এবং যাদের সঙ্গে ওঠাবসা ও কথাবার্তা বলো তাদের সঙ্গে সদাচরণ করবে যাতে আল্লাহর কাছে সেগুলো সঞ্চিত দেখতে পাও।

হে আলী! যা কিছু নিজের জন্য পছন্দ করো না, তা অন্যের জন্যও কামনা করো না। আর যা কিছু নিজের জন্য পছন্দ করো, তা তোমার ভাইয়ের জন্যও চাও। যাতে তোমার বিচারে ন্যায়বান হতে পারো এবং তোমার ন্যায়বিচারে সুবিচারক হতে পারো, আর আসমানবাসীর কাছে প্রিয় হতে পারো, আর জমিনবাসীর বুকে বন্ধুর আসন করে নিতে পারো। আমার এ অসিয়তকে সংরক্ষণ করো মহান আল্লাহ চাহেন তো।

এবারে শামউন ইবনে লাভি ইবনে ইয়াহুদা নামক একজন পাদ্রির নানা প্রশ্নের জবাবে বিশ্বনবী (সা.) যেসব অমূল্য বক্তব্য রেখেছিলেন সেগুলোর কিছু প্রধান অংশ এখানে তুলে ধরবো। শামউন ঈসা (আ.)-এর জনৈক হাওয়ারীর বংশধর ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে অনেক প্রশ্ন তুলে ধরেন। আর রাসুল (সা.) তার সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। ফলে শামউন তাঁর প্রতি ইমান আনেন এবং তাঁর নবুয়তকে সত্য বলে স্বীকার করে নেন।

এক পর্যায়ে শামউন বলেন : আমাকে বলুন দেখি আকল তথা বুদ্ধিবৃত্তি কী এবং তার প্রকৃতি কিরূপ? তা থেকে কী নির্গত হয় এবং কী নির্গত হয় না? সেগুলোর সব শ্রেণীর ব্যাখ্যা দিন। রাসুলে খোদা (সা.) বললেন :

'আকল হলো অজ্ঞতা এবং নাফসের একটি বাঁধন। নাফস (প্রবৃত্তি) জঘন্যতম জন্তুর মতো। যদি এ বাঁধন না থাকে, তা হলে তা পাগলা কুকুর হয়ে যায়। সুতরাং আকল হলো অজ্ঞতার বাঁধন। আল্লাহ আকলকে সৃষ্টি করলেন এবং তাকে বললেন : সামনে ফেরো। সে ফিরলো। তাকে বললেন : পেছনে ফেরো। সেও পেছনে ফিরলো। আল্লাহ বললেন : আমার মহিমা ও মর্যাদার শপথ, তোমার চেয়ে বড় এবং অধিক অনুগত কোনো সৃষ্টিকে আমি সৃষ্টি করিনি। তোমাকে দিয়েই শুরু করবো এবং তোমাকেই নিজ দরগাহে ফিরিয়ে আনবো। পারিশ্রমিক এবং সওয়াব তোমার জন্যই। শাস্তিও তোমার ভিত্তিতেই হবে। আকল থেকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা নির্গত হলো। আর ধৈর্য থেকে জ্ঞান। আর জ্ঞান থেকে চিন্তার পরিপক্বতা, আর চিন্তার পরিপক্বতা থেকে চারিত্রিক পবিত্রতা। আর চারিত্রিক পবিত্রতা থেকে আত্মসংযম। আর আত্মসংযম থেকে লজ্জা। আর লজ্জা থেকে ব্যক্তিত্ব ও স্থিরচিত্ততা, আর ব্যক্তিত্ব ও স্থিরচিত্ততা থেকে অব্যাহতভাবে সৎকাজে প্রবৃত্ত হওয়া। আর অব্যাহতভাবে সৎ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া থেকে মন্দ কাজকে ঘৃণা করা। আর মন্দ কাজকে ঘৃণা করা থেকে উপদেশদাতার উপদেশ মেনে চলা। এ হলো কল্যাণের দশটি শ্রেণী। এ প্রত্যেক শ্রেণীর আবার দশটি করে প্রকার রয়েছে।

বিশ্বনবী (সা.) আরো বলছিলেন, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা থেকে (আসে) : ১. সুন্দর বৈশিষ্ট্যে সজ্জিত হওয়া ২. পুণ্যবানদের সঙ্গে ওঠাবসা ৩. লাঞ্ছনা দূরীকরণ ৪. নীচতা থেকে নির্গমন, ৫। কল্যাণের প্রতি ঝোঁক, ৬. উচ্চতর মর্যাদার নিকটবর্তী হওয়া, ৭. মার্জনা ৮. অবকাশ প্রদান, ৯. সদাচার, ১০. নীরবতা। বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহিষ্ণুতা থেকে এসব নির্গত হয়।

আর জ্ঞান থেকে নির্গত হয় :

১. অভাবহীনতা, এমনকি যদি নিঃস্বও হয়ে থাকে। ২. দানশীলতা, যদিও সে কৃপণ থাকে। ৩. ব্যক্তিত্ব ও ভাবমূর্তি, যদিও সে বিনয়ী থাকে, ৪। সুস্থতা, যদিও সে রুগ্‌ণ থাকে, ৫. নৈকট্য, যদিও সে দূরে থাকে, ৬. লজ্জাশীলতা, যদিও সে মুখরা থাকে, ৭. মর্যাদাশীলতা, যদিও সে অধীনস্ত হয়, ৮. আভিজাত্য, যদিও সে নীচ (বংশের হয়ে) থাকে, ৯. প্রজ্ঞা এবং ১০. (যোগ্যতা, সুযোগ-সুবিধা ও সময়ের) সদ্ব্যবহার।

এগুলো হলো আকল-সমৃদ্ধ বা বিবেকবান ব্যক্তির জ্ঞানের ফল। সুতরাং ধন্য হোক সে ব্যক্তি যে আকলকে প্রয়োগ করেছে এবং জ্ঞানলাভ করেছে।

বিশ্বনবী (সা.) আরো বলছিলেন, আর চিন্তার পরিপক্বতা থেকে নির্গত হয় :

১. অবিচলতা, ২. হেদায়েত, ৩. সৎকর্মশীলতা ৪. সংযমশীলতা, ৫. সফলতা, ৬. মধ্যপন্থা, ৭. মিতাচার, ৮. পারিশ্রমিক ও সওয়াব ৯. মর্যাদা ১০. আল্লাহর দীনকে অনুধাবন।

এগুলো বিবেকবান ব্যক্তি তার চিন্তার পরিপক্বতা থেকে লাভ করে। ধন্য হোক সেই ব্যক্তি যে সঠিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে চলে।

আর চারিত্রিক পবিত্রতা থেকে যা যা উৎসারিত হয় সেগুলো হলো :

১. সন্তুষ্টি, ২. প্রশান্তি ৩. উপকার লাভ, ৪. শান্তি, ৫. যাচাই (সতর্ক অনুসন্ধান), ৬. বিনয়, ৭. (আল্লাহর) স্মরণ, ৮, চিন্তা-গবেষণা, ৯, বদান্যতা, ১০. উদারতা।

এগুলো বিবেকবান ব্যক্তির চারিত্রিক পবিত্রতা থেকে উৎসারিত হয় আর সে আল্লাহর প্রতি ও নিজের ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। আর আত্মসংযম থেকে যা যা উৎসারিত হয় সেগুলো হলো : ১. কল্যাণ চিন্তা, ২. বিনয়, ৩. সংযম ৪. তওবা, ৫. বোধশক্তি, ৬. শিষ্টাচার, ৭. সদাচার ৮. বন্ধুত্ব, ৯. কল্যাণকর এবং ১০. সুআচার-ব্যবহার। এগুলো বিবেকবান ব্যক্তি তার সম্ভ্রম থেকে লাভ করে। ধন্য সেই ব্যক্তি যার প্রভু তাকে আত্মসংযমের বৈশিষ্ট্য দিয়ে সম্মানিত করেন।

বিশ্বনবী (সা.) আরো বলছিলেন, আর লজ্জা থেকে উৎসারিত হয় :

১. নমনীয়তা, ২. দয়াশীলতা, ৩ ও ৪. প্রকাশ্যে এবং গোপনে আল্লাহর পাহারার প্রতি মনোযোগ, ৫. (দৈহিক ও মানসিক) সুস্থতা, ৬, মন্দ থেকে দূরে থাকা, ৭. সমৃদ্ধি, ৮. দানশীলতা, ৯. বিজয় এবং ১০. মানুষের মাঝে সুনামের সঙ্গে স্মরণ। এগুলো বিবেকবান ব্যক্তি তার লজ্জা থেকে অর্জন করে। সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর নসিহত গ্রহণ করে এবং তাঁর অপমানকে ভয় করে।

আর ব্যক্তিত্ব ও স্থিরচিত্ততা থেকে উৎসারিত হয়: ১. দয়া, ২. পরিণামদর্শিতা, ৩. আমানত রক্ষা, ৪. খেয়ানত বর্জন, ৫. সত্যবাদিতা, ৬. লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা, ৭. সম্পদের পরিশুদ্ধি, ৮. শত্রুর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি, ৯. অসঙ্গত কাজ থেকে নিষেধ, ১০. বোকামি বর্জন। বিবেকবানরা এসব বিষয় ব্যক্তিত্ব ও স্থিরচিত্ততা থেকে পেয়ে থাকেন। সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তিত্ব ও স্থিরচিত্তের অধিকারী হয় এবং যার মধ্যে লঘুচিত্ততা আর মূর্খতা থাকে না এবং যে ক্ষমাশীল হয় ও মার্জনা করে। ■

সূত্র: আইআরআইবি

আমি কে, কী করি : আমি আত্মার প্রতিনিধি

নিজাম

বস্তুত সৃষ্টির কয়েক কোটি বছর পর আমার আমিত্বের বীজ বপন হয় পিতার মেরু মজ্জা থেকে স্খলিত এক ফোঁটা নাপাক পানি মাতৃগর্ভে পতিত হয়ে। এখান থেকে আমার আমিত্বের যাত্রাপথ শুরু। এই নাপাক পানির ফোঁটাটির স্খলনও এক অদৃশ্য শক্তিমান আল্লাহ বা এক মহাশক্তির ইশারায় সংঘটিত হয়। মাতৃগর্ভে আমার পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সেই সেরাতুল মুস্তাকিমের নিয়মেই মহাশক্তির ইচ্ছায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রবিশিষ্ট এক দেহের রূপান্তর হয়। গর্ভস্থ দশ মাসকালে দেহ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আমার আমিত্ব অতি সূক্ষ্মভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই দেহ গঠনে আমার কোনোই কর্তৃত্ব নেই। যথারীতি সেই মহাপ্রভুর ইশারা-ইঙ্গিতেই মাতৃগর্ভস্থ রাসায়নিক খাদ্যপুষ্টিতে সেই আদম-সুরত প্রাপ্ত হতে থাকি। আমার এই অবস্থা পার্থিব পরিবেশমুক্ত থাকে বলে তখন আমার রিপুর সৃষ্টি হয় না। রিপুর সমন্বয়ে গঠিত মনেরও অস্তিত্ব থাকে না। তাই মাতৃগর্ভের সুখ-দুঃখের কথাও মনে থাকে না। কারণ মনে রাখার দায়িত্ব মনের। তাই মাতৃগর্ভ থেকে প্রসবকালে মায়ের কষ্ট ও আমার কষ্ট মনে নেই। যদিও ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুমাত্রই কষ্টে চিৎকার দেয় একমাত্র ঈসা (আঃ) ও তাঁর মা মরিয়ম (আঃ) ছাড়া। এই চিৎকারের কথাও মনে নেই, কারণ স্মরণশক্তি ও মন তখনো অত্যন্ত ক্ষীণ, অপরিপক্ব।

পিতার মেরু থেকে মাতৃগর্ভে ও মাতৃগর্ভ থেকে পার্থিব জীবন

এই দুই স্থানান্তরের মধ্যে আমি নিষ্ক্রিয়। আমিত্ব সুপ্ত, শুধু এক অদৃশ্য মহাশক্তির ইচ্ছায় আমার এই প্রজ্ঞাময় সত্তার স্থানান্তর। প্রসবান্তে আমার এই প্রজ্ঞাময় সত্তাও তাঁরই ইচ্ছামতো পার্থিব কর্ম সমাধানের জন্য পরিবর্ধিত হতে থাকে। এই পরিবর্ধনের জন্য মাতৃস্তনে আমার জন্মের আগে থেকেই প্রয়োজনীয় খাদ্যরস, দুগ্ধ প্রস্তুত করে রাখেন তিনি। মাতৃস্নেহও তাঁরই মোতোওয়াজ্জেহ বা সৃষ্টিজগতের প্রতি তাঁরই স্নেহাকর্ষণের নমুনা। যা জীবের প্রত্যেক মাতা-পিতাকেই তার সন্তানের জন্য তিনি দিয়েছেন। আমার দেহ গঠনের জন্য খাদ্যস্পৃহাও আমার খাদ্য পরিপাক যন্ত্রের উপাদানেরই স্বভাব মাত্র। যেমন চুম্বকের স্বভাব লোহাকে আকৃষ্ট করা। শিশু অবস্থায় আমার চাওয়া-পাওয়া, খাওয়া ও দেহবৃদ্ধি সবই সেই অদৃশ্য মহাশক্তির চিরাচরিত সহজ-সরল গতানুগতিতে সাধিত হচ্ছে। এই দেহটি গঠনকার্যে তাঁর কোনো প্রকারই পরিশ্রম হয় না। শুধু তাঁর ইশারায় বা ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সিরাতুল মুসতাকিমের পথে চালিত ও সমাধা হচ্ছে। আমার করার কিছু নেই। আমি শুধু পরিবেশ প্রতিক্রিয়ায় অনুভূতিশীল একটি প্রজ্ঞাময়, অহং বা আমিত্ব চেতনা সত্তা। মাতৃস্নেহে মাও তাঁর দৈহিক ও মানসিক নানা কষ্ট-ক্লেশের চেয়েও বেশি কষ্টবোধ করেন যখন আমার দেহ পুষ্টির জন্য পাকস্থলির উপাদান খাদ্যরসের অভাব বোধ করে, অর্থাৎ ক্ষুধায় আমি খাদ্যের জন্য চিৎকার করি। এই চিৎকার শুধু আমার দৈহিক গঠনের বিরতিহীন দ্রুতগতির প্রতিরোধের প্রতিবাদ সংকেত মাত্র। এটাও সেই মহাশক্তির দেয়া দৈহিক যন্ত্রের উপাদানের স্বভাব ছাড়া কিছু না। এ সবের মধ্যেও আমার কর্তৃত্ব কিছু নেই। আমি যতই পার্থিব খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল হই, মাতৃস্তনের খাবারের প্রতিও আমার অনীহা জন্মায়। মায়ের স্নেহাকর্ষণ হালকা হতে থাকে। দেহকে কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বী করার জন্য দেহের যন্ত্রের উপাদানও অধিক পুষ্টিকর খাদ্য শোষণ করতে চায়। যাকে বলে খাদ্যলোভ। এ খাদ্যলোভও আমার প্রজ্ঞাময় সত্তার অধীন নয়। এটাও চুম্বকের আকর্ষণের মতো বস্তুর প্রতি বস্তুবিশেষের আকর্ষণ মাত্র। তাই আমার সৃষ্টির শুরু থেকে কর্মক্ষম দেহের গঠন পর্যন্ত মূলত আমার করার কিছুই নেই। শুধু আমি একটি প্রজ্ঞাময় চেতনা সত্তা, অহং বা আমিত্ব বোধই মাত্র। মাতৃদুগ্ধ পোষ্য অবস্থা পর্যন্ত আমিত্ব বা অহংজ্ঞান অতি সূক্ষ্ম, সাত্ত্বিক, পবিত্র, স্বর্গীয় সত্তাস্বরূপ থাকে। তাই কোনো শিশুর মৃত্যু হলে এই পবিত্র শিশুর অসিলায় পিতামাতা স্বর্গলাভ করেন। (হাদিস)।

প্রত্যক্ষভাবে এরপর থেকে শুরু হয় পিতামাতার দৈহিক পরিশ্রম বা কষ্টার্জিত পার্থিব খাবারের ওপর আমার নির্ভরশীলতা। যাতে থাকে হালাল-হারাম বা সৎ ও অসৎ উপায়ে অর্জিত খাদ্যের প্রশ্ন। খাদ্যের দ্রব্যগুণই স্থূলদেহ গঠনের একমাত্র বস্তু। এই খাদ্য-দ্রব্যগুণ দেহ গঠনে বা কর্মময় করার জন্য হালাল-হারামের ওপর নির্ভরশীল নয়। তবে দেহ যেমন খাদ্যের দ্রব্যগুণের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, আমার প্রজ্ঞাময় সত্তা বা আত্মা ও তাঁর স্বভাবজাত বিবেক-বুদ্ধি তেমনিই সৎ ও অসৎ উপায়ে অর্জিত খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। হযরত বায়েজিদ (রহঃ) মাতৃ গর্ভে থাকাকালীন তাঁর মা হালাল-হারাম সন্দেহজনক খাদ্য পেটে নিলেই তা নড়াচড়া আরম্ভ করতো ও বমি না করা পর্যন্ত তা করতো।

দেহ গঠনের জন্য একই খাদ্য সৎ ও অসৎ উপায়ে অর্জিত হলেও দেহের গঠন বা পুষ্টি অনেকটা একই হবে যদিও তার চেহারায় সৎ-অসতের কিছু অস্বচ্ছতার ছাপ পড়ে। তবে পার্থক্য হবে, শুধু বিবেক-বুদ্ধির। সৎ উপায়ে অর্জিত খাবারে গঠিত দেহে আত্মা বা প্রজ্ঞাময় সত্তা স্বচ্ছ, নির্মল থাকে এবং স্বভাব বা বিবেকও সাত্ত্বিক হবে। বুদ্ধিও সূক্ষ্ম ও প্রজ্ঞাময় সত্তাকে স্বচ্ছ রাখার জন্য সহায়ক হবে। নিজেকে ও প্রতিপালককে চেনার মারফত জ্ঞান বেশি হবে। এই মরদেহেই আত্মা স্বর্গীয় শান্তি পাবে। পরমাত্মার সঙ্গে মিলন সহজ-সরল হবে।

আর অসৎ উপায়ে অর্জিত খাবারে গঠিত দেহে আত্মা বা প্রজ্ঞাময় সত্তা কলুষিত বা অস্বচ্ছ হবে। বিবেক ক্ষীণ হবে, বুদ্ধি ভুল বা নষ্ট হবে। প্রজ্ঞাময় সত্তা বা আত্মা কলুষিত ও পথভ্রষ্ট হবে। পরমাত্মার সঙ্গে মিলন পথ প্রলম্বিত ও কষ্টকর হবে। (চলবে)

আপনি জানেন কি—

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ) স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

এ গ্রন্থে রয়েছে হুজুর জৌনপুরির (রহঃ) নিজের প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, গ্রন্থিত, অগ্রন্থিত প্রায় সমস্ত রচনা এবং প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদের লেখাসহ হুজুরের দুর্লভ ছবিসহ অ্যালবাম। এ গ্রন্থের পরিকল্পনা, সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ। পনের শ' পৃষ্ঠার এ গ্রন্থের মূল্য ১,৫০০ টাকা। আগ্রহী পাঠক ও ভক্তবৃন্দের জন্য রয়েছে ২০% মূল্য ছাড়ের ব্যবস্থা। আপনি সংগ্রহ করুন এ মহামূল্যবান স্মারক গ্রন্থ। আপনার সংগ্রহে রাখা এ গ্রন্থটিই হবে সুন্দর ও সত্য পথে চলার পাথেয়। আপনার কপি সংগ্রহ করুন—

প্রাপ্তিস্থান : **পাঠক সমাবেশ**, ১৭ ও ১৭/এ (নিচতলা) আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন (মোবাইল) : ০১৮১৯২১৯০৮১।

এবং

ডা. হাবিবুর রহমান

মোবাইল : ০১৯১৩৮২০৭৫৬

আয়েশা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২২১/১, বাইতুর রহিম জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, পূর্ব মনিপুর (নুরানি পাড়া), মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

‘বায়াত’ প্রসঙ্গে আলোচনা

কাজী বেনজীর হক চিশতী নিজামী

‘বায়াত’ প্রসঙ্গে আলোচনা– এই লেখাটি কাজী বেনজীর হক চিশতী নিজামীর ‘বেহুঁশের চৈতন্য দান’ গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আল্লাহপাক বলেছেন : ‘ফাইন জালালতুম মিন বাদে মা জাআতকুমুল বাইয়্যেনাতু’ অর্থাৎ– সুতরাং তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট বাইয়্যেনাত (ইনসানুল কামেল, যা কুরানুন নাতেক এবং পতিত মানব জাতিকে তারা আল্লাহর কালাম দিয়ে হেদায়েত করেন) আসার পরও তোমাদের যদি অধঃপতন (পদস্খলন) হয়। ‘ফাআলামু আননাল্লাহা আজিজুন হাকিমুন’ অর্থাৎ– সুতরাং জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বোচ্চ হেকমতের অধিকারী (বাকারা/২০৯)। পীর সাহেব ইমাম সাহেবকে মুরিদ করতে পারতেন, কিন্তু স্বীয় ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন না দিলে মুরিদই হয় না; আর ইমাম সাহেব তা পারেননি বিধায় তিনি তাকে মুরিদ করেননি, তবে দয়া করেছেন বিধায় ইমান রক্ষা পেয়েছে। ব্যবসায়ী পীর হলে মুরিদ করতেন এবং প্রচার করতেন আমার কাছে অমুক মওলানা সাহেব মুরিদ হয়েছে। জাহেরি বিদ্যা যে পরলোকে কোনো কাজেই আসবে না তা তিনি প্রমাণ করে দিলেন। নয়তো আজ মৌলবী সাহেবেরা বলে বেড়াতেন যে, ইমাম ফকরউদ্দিন রাজি বড় মওলানা ছিলেন বলেই কামালিয়াত অর্জন করেছেন, পীর সাহেবের কারণে নয়। ইনসানুল কামেল বা পীর-আউলিয়া হবার জন্য মাদ্রাসার বিদ্যার কোনো শর্ত নেই, বরং তা পর্দা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তবে জাহেরি বিদ্যার ভেদ-রহস্য যারা বুঝেন তাদের জন্য ক্ষতি নেই। তাই খাজা বাবা গরিবে নেওয়াজ (রহঃ) বলেছেন : ‘একটি গণ্ডমূর্খও যদি ফানাফিল্লাহর স্তর অতিক্রম করে আসতে পারেন তাহলে তিনি দুনিয়ার যে কোনো বিখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তি থেকে কোটি গুণে জ্ঞানী।’ বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেছেন : ‘যদি কেউ পীরের দরবারে যাও তবে জাহিরি বিদ্যা পরিত্যাগ করে তারপর যেও’ (আল ফাতহুর রাব্বানি ওয়া ফায়জুর রাহমানি, ৪৬ পৃ:)। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান হানাফি মাজহাবের অন্তর্ভুক্ত। এ মাজহাবের ইমাম হলেন আবু হানিফা, তাঁর আসল নাম ‘নোমান’। যারা ‘হানাফি’ মাজহাবের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করছেন তারা হয়তো শুনে অবাক হবেন যে, সেই ইমাম আবু হানিফা ইমাম জাফর আস সাদেকের কাছে মুরিদ হয়ে বললেন যে, ‘যদি আমি ইমাম জাফর আস সাদেকের কাছে বায়াত না হতাম, তবে আমি নোমান ধ্বংস হয়ে যেতাম।’ ইমাম আহম্মদ হাম্বল (রাঃ) মুরিদ হয়েছেন হযরত বিশর হাফি (রাঃ)-এর কাছে। মওলানা রুমি (রহঃ) তাঁর সমস্ত কিতাব ফেলে দিয়ে হযরত শামসে তাবরিজের (রহঃ) কাছে গিয়ে মুরিদ হয়ে তাঁর গোলামি স্বীকার করে নিলেন এবং তাঁর ইশকে দেওয়ানা হালতে জীবন কাটিয়েছেন। তারই ফলস্বরূপ তিনি বিশ্ববিখ্যাত কিতাব ‘মসনবি শরিফ’ রচনা করলেন, যাকে মানব রচিত ফার্সি ভাষার ‘কুরআন’ বলে অভিহিত করেছেন তিনি। অথচ তাঁর মুর্শিদও লেখাপড়া জানতেন না। মওলানা রুমি (রহঃ) তাঁর মুর্শিদের কাছে বায়াত হবার পর বললেন :

‘খোদবোখোদ মোল্লারোম কামেল না শোদ,
তা গোলামে শামসেতাব্রিজি না শোদ।’

অর্থাৎ–
মোল্লারোম নিজে নিজে কামেল হতে পারেনি যে
পর্যন্ত না শামসে তাবরেজির গোলামি করেছে।

এ ধরনের হাজারো প্রমাণ রয়েছে ওলি-আউলিয়াদের পক্ষ থেকে, যা তুলে ধরলে কিতাব অনেক বড় হয়ে যাবে। বায়াত না হয়ে কেউই মুসলমান হতে পারেননি বা আল্লাহর ওলি হতে পারেননি এবং পারবেনও না, পারবেন মোল্লা-মৌলবি হতে, যারা তথাকথিত মুসলমান, আমানু তো নন-ই। কুরআনের সুরা মুমিনের ৬০ নং আয়াতে বলা হয়েছে : ‘ওয়াক্বা-লা রাব্বুকুমুদউনি আস্তাজিব লাকুম; ইন্নাল্লাযিনা ইয়াস্তাকবিরুনা।’ অর্থাৎ– হে মানুষ, তুমি একা হও এবং একা (উদউনি) হয়ে আল্লাহকে ডাক দাও, তাহলে ডাকের জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাবে।’ একা হওয়া মানে মানুষের মধ্যে ‘খান্নাসরূপী’ শয়তান বাস করে, এ শয়তানকে দূর করতে পারলে প্রতিটা মানুষ একা হয়ে যায়, ঐ মানুষের অস্তিত্বে এক আল্লাহই ‘রব’ রূপে মূর্তিমান হয়ে ওঠেন তথা বান্দা ফানা হয়ে যায় এবং আল্লাহ ঐ মানুষের মধ্যে বাকা হয়ে যান। এ অবস্থায় পৌঁছে শ্রী শ্রী চৈতন্যদের বলে ফেলেন: ‘তুই মুই, মুই তুই’ অর্থাৎ তুইই আমি, আমিই তুই তথা সাধক বলে ফেলেন, আনাল হক তথা আমিই সত্য। এ অবস্থায় আল্লাহ বান্দার হয়ে বলেন : ‘ফালাম তাকতুলুহুম ওয়ালা কিন্নাল্লাহা কাতালাহু’ অর্থাৎ তোমরা তাদের হত্যা করোনি। বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন। ‘ওয়ামা রামাইতা এজ রামাইতা ওয়ালা কিন্নাল্লাহা রামা’ অর্থাৎ এবং তুমি (রাসুল) যখন (ধূলি) নিক্ষেপ করছিলে তা তুমি নিক্ষেপ করোনি, বরং আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছেন (আনফাল/১৭)। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন : ‘আনা ইয়াদুল্লাহ’ অর্থাৎ আমি আল্লাহর হাত। এ অবস্থায় শেখ সাদি (রহঃ) বলেছেন : ‘আগার ইয়ারি আজ শেখতন দমে মজান, কে শেরেকাস্ত বা ইয়ারো বা শেখতন’ অর্থাৎ– যদি তুমি প্রেমিক হতে চাও, তবে নিজেকে ভুলে যাও। কারণ, শরিয়ত অনুযায়ী বন্ধুর সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখো, এটা শেরেকি বলে ধরে নেয়া হয়েছে। মওলানা রুমি (রহঃ) বলেছেন : *‘মানতু শুদম তুমান শুদি মানতুন শুদম তু জা শুদি, আঁকশ কেনা গোয়েদ আজই মানদিগর তু দি গরি’* অর্থাৎ– আমি তুমি হলাম তুমি আমি হলে, আমি দেহ, তুমি প্রাণ। এরপর যেন কেউ বলতে না পারে যে, আমি একজন আর তুমি আর একজন। তাহলে ‘আনাল হক’ মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) বলেননি– বলেছেন আল্লাহই, *‘সোবাহানি মা আজিমুশশানি’* এ কথা বায়েজিদ বোস্তামি (রহঃ) বলেননি– আল্লাহই বলেছেন। এ ধরনের হাজারো ঘটনা ওলিদের মুখ দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, যা মূলত আল্লাহই বলেছেন। আর মৌলবিরা তার হাকিকত বুঝতে না পেরে ওলিদের বিরোধিতা করেছে, কাফের ফাসেক ইত্যাদি বলে ফতোয়ার কাদা ছুড়ে দিয়েছে, অত্যাচার নির্যাতন করেছে, হত্যা করেছে। তা যে মূলত আল্লাহরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং আল্লাহরই বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছে এ হুঁশ জ্ঞানটুকুও বুঝার সাধ্য তাদের নেই; এটাও তকদির। এ তৌহিদ সাগরে যারা ডুব দিয়েছেন তারাই ইনসানুল কামেল নবুয়তে নবী-রাসুল এবং বেলায়েতে ওলি-আউলিয়া, পীর-মুর্শিদ। এ তৌহিদে অবস্থান করেই খাজা বাবা গরিবে নেওয়াজ (রহঃ) বলেন : *‘সিফাত ও জাত চু’ আজ হাম খোদা নামি বেনাম– বাহার চেমি নাগরম্ জাজ খোদা নামি নোম’* অর্থাৎ– স্বয়ং (জাত) এবং গুণাবলি (সিফাত)-কে আলাদাভাবে আমি যখন রেখেছিলাম, তখন আমি যা-ই দেখি, খোদা ছাড়া আর কিছুই দেখি না। কিন্তু মানুষকে খোদা বলা যায় না। যেমন, বাষ্পকে পানি বলা যায় না, পানিকে বরফ বলা হয় না, অথচ তিনের মধ্যে একেরই অবস্থান, শুধু নাম ও রূপের পর্দায় আবৃত আছে। (চলবে)

■ **প্রধান সম্পাদক :** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, ■ **নির্বাহী সম্পাদক :** নিশাত বদরুল ■ **অঙ্গসজ্জা :** মেটাকেভ ডেভলপমেন্ট ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৮/১ তেজকুনিপাড়া, ফার্মগেট, ইলিক্রস কলেজ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫ থেকে মুদ্রিত।